



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 510 - 516

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

যুগপুরুষ রামমোহন : প্রবর্তক ও নিবর্তক

ড. ঋতব্রত বসুমল্লিক

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি

Email ID : basumallikritabrato@gmail.com

Received Date 16. 06. 2024

Selection Date 20. 07. 2024

Keyword

Raja Rammohan
Roy, Death
Penalty with Sati-
Immolation,
Succession,
Vedanta,
Evangelism,
Reformation,
Prejudice.

Abstract

Raja Rammohan Roy, one of the renowned thinkers who played a leading role in social reform in the 19th century, He wanted to awaken the consciousness of the nation by appearing in a caste-based country full of cosmopolitan fanaticism and prejudice. According to Rabindranath, he was a globalist ('Biawapathik'). His attitude towards everything, such as religion, was mainly guided by his humanistic outlook. Adopting Vedanta's Brahmanism, Rammohan created the foundation of his own ideas, dharma prachar, social reform, all associated with his discourses. But it should be remembered that, he knew that, in order to get something, it is necessary to have a rational sense of why to get it in the recipient, then only that person and then his behavior can be properly treated. Even though he himself was a Sanskrit scholar and a wise person he opposed the establishment of Sanskrit college and Sanskrit education. But this opposition should not be taken as ideological opposition to Sanskrit. Because he understood that, if the countrymen were not educated in Western education, it was not possible to progress. The Sanskrit education of the nineteenth century would not be fruitful for Indians personally and for their livelihood. Englishman as well as the East India Company who took the responsibility of ruling India, needed to learn English to keep up with them, but he was in favor of modernity while respecting the Indian tradition and culture. Together with these two way, the path of human progress will be widened. He also took strong steps to protect the rights of women as well as the freedom of expression. All this came in the context of his refined thoughts. At the same time, one thing must be very consciously remembered that, Rammohan did not stop at just realizing or expressing his ideas and realizations. A large part of Rammohan's reform movement covered with the wellness of women. He raised the question of rights and was concerned about the rights of women in subject property. Rammohan played the role of simultaneous promoter and detractor in various fields such as Dharma Samaj Act etc.



Discussion

কথামুখ : মধ্যযুগের বাংলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে যেসকল মনীষী আপন আপন প্রকাশে সমুজ্জ্বল, রাজা রামমোহন রায় তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। হুগলী জেলার রাধানগর নিবাসী এই মানুষটি নিজ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার স্করণে চিরশ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। অবশ্য তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে বহু অপমান, কষ্ট সহিতে হয়েছে তাঁর আপন দেশের লোকের কাছে, নিজভূমে প্রায় পরবাসী হয়েই ছিলেন তিনি; কিন্তু তজ্জন্য তিনি আপন কর্তব্যনিষ্ঠায় বিন্দুমাত্র কাৰ্পণ্য করেননি। তিনি রাজা হয়েই রাজাসনে বসেছিলেন। তাঁকে যে ‘প্রথম আধুনিক মানুষ’ হিসাবে অভিহিত করা হয়, তাতে কোন অতিরঞ্জন নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘ভারতপথিক’ বলেছেন – এই অভিধাকে মান্যতা দিয়ে আরও একটু অগ্রসর হয়ে তাঁকে ‘বিশ্বপথিক’ও বলা চলে। স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ভারতবর্ষের সনাতন বাণীকে পৌঁছে দিয়েছিলেন রামমোহন রায়। ধর্মাক্ষ, গৌড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, জাতিভেদনির্ভর সমাজে তথা দেশে আবির্ভূত হয়েও এই সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে রামমোহন এইসব কিছু মূলে আঘাত করে জাতির চৈতন্যকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনের আগে বিভিন্ন টুকরো টুকরো শাসনের পাকে পড়ে ভারতবর্ষের যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল সেখানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেন্দ্রীয় শাসন এককভাবে ভারতের এই বহুখা বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিকতাকে একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে যে আনতে পারবে এই বিষয়ে সেকালে অনেকেই নিঃসন্দেহ ছিলেন। রামমোহনও তাঁদের মধ্যে পড়েন বটে, তবে তাঁর চিন্তন, মনন, দূরদর্শন ও প্রজ্ঞালব্ধ উপলব্ধির কারণে সেই দলের দলী হয়ে ওঠেন না; নিজস্বতাকে বজায় রাখতে পারেন।

কথারম্ভ : রামমোহন বলতে গেলে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই চালিত হয়েছেন। ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মনোভঙ্গি বা এতাদৃশ বিষয়ে রচনা – সবকিছুর পিছনেই এই মনুষ্যত্ব ভাবনা সক্রিয় ছিল। ইসলাম, সুফি, খ্রীস্টান – এই তিন ধর্মমতের একেশ্বরবাদ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বলে অনেকেই মনে করেন; কিন্তু এটাও বিবেচ্য যে, ভারতীয় শ্রুতি প্রস্থানের নিরাকার ব্রহ্মের ধারণাকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। উপনিষদ অনুবাদ করে তার প্রচার করেছেন রামমোহন। কাজেই বেদান্তের ব্রহ্মবাদকে যে তিনি সম্যক ভাবেই নিজস্ব ধারণার ভিত্তি রূপে গ্রহণ করেছিলেন এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। একজন অনুভবী, দূরদর্শী মানুষ যখন আপন প্রজ্ঞার আলোকে স্বচ্ছ ধারণা এবং তার প্রায়োগিক দিকটিকে সর্বজনীন ভাবে দেখতে চান, তখনই পারিপার্শ্বিক সমস্যাসমূহ তাঁর সম্মুখে সেই প্রায়োগিকতার বিরুদ্ধে প্রাচীর তুলে দেয়। রামমোহনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তাতে রামমোহনের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে কোন হানি ঘটেনি। তাঁকে সেকালের সমাজরক্ষকেরা গঞ্জনা দিয়েছে, লাঞ্ছনা করেছে – হত্যা করার অপচেষ্টা পর্যন্ত করেছে; কিন্তু এতকিছু করেও তাঁকে নিজস্ব যুক্তি, দৃঢ়তা থেকে টলাতে পারেনি।

ধর্মচিন্তন, ধর্মপ্রচার, সমাজ সংস্কার – এই সবই রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কিত আলোচনার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই সবকিছুর পিছনে ছিল মানুষকে অবহিত করে তোলার মহতী উদ্দেশ্য। কারণ তিনি জানতেন, কোনকিছু পেতে হলে কেন পেতে হবে – এই যুক্তিবোধ প্রাপকের মধ্যে থাকাকাটা প্রয়োজন, তবেই সেই প্রাপ্তি ও পরে তার ন্যাস রক্ষণ যথাযথভাবে হওয়া সম্ভব। তার সঙ্গে এটাও তাঁর উপলব্ধিতে ছিল যে, যাদের মধ্য থেকে তিনি জনমত গঠন করতে চাইছেন তাদের সেই মত গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারটুকু হওয়া খুব দরকার। আর সেইজন্য তাদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। উনিশ শতকে সংস্কার আন্দোলনগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, পণপ্রথা ইত্যাদিকে ধরা যায়। আবার অন্যদিকে মদ্যপান, অন্তর্জালি যাত্রা, স্ত্রী স্বাধীনতা, বারবধু-গমন, মহিলাদের বিষয়াধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে জনগণ বিশেষ চিন্তাশ্রিত ছিলেন বলে মনে হয় না। যদিও মাইকেল মধুসূদনের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ ও ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ প্রহসনদুটিতে নব্যযুবক সম্প্রদায়ের সুরাসজ্জি, ভূস্বামীর পরনারী আসক্তিকে কটাক্ষ করা হয়েছে। কিন্তু এগুলি অনেকটাই পরবর্তীকালের। রামমোহনের কালে সংস্কারকগণ এই বিষয়গুলি নিয়ে খুব একটা গেল গেল রব তোলেননি। রামমোহন এর ব্যতিক্রম ছিলেন। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকতে পারেননি নানা জনের বিরোধিতার কারণে; তবে কলেজ স্থাপনের এই মহতী প্রয়াসকে তিনি সর্বতোভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কারণ তাঁর দূরদৃষ্টিতে এইটুকু সারসত্য ধরা পড়েছিল যে, এই



প্রতিষ্ঠাকার্যের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জুড়িয়ে থাকুন বা না থাকুন – এই প্রয়াস সার্বিকভাবে দেশের মানুষের উন্নতির সহায়ক হবে। আর শিক্ষিত মানুষ তার প্রজ্ঞার আলোকে সঠিক বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবে।

রাজা রামমোহন রায় শুধু ধর্মচিন্তক বা প্রচারক ছিলেন না, তিনি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন, জুরিগণের বিচার প্রবর্তনের জন্য পরিশ্রম করেছিলেন। সেইসঙ্গে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্ত্রীগণের অধিকার সংরক্ষণ বিষয়েও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করেছিলেন। এই সবকিছুই কিন্তু এসেছিল তাঁর পরিশোধিত চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর এই মনন-চিন্তন প্রথমে তিনি প্রকাশ করেছিলেন ১৮০৩-০৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ফার্সি ভাষায় লেখা ‘তুহফাৎউল মুয়াহ্হিদীন’-এর মধ্যে। তিনি তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে বুঝেছিলেন যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যেমন উন্নতি দরকার তেমনই ভাবে ঐতিহ্যপূর্ণ ধর্মের সংশোধনের সঙ্গে নূতনত্বের সংশ্লেষণও জরুরী। লোক-ব্যবহারগত বিশিষ্টতায় চিন্তায় সর্বজনীনতা আনতে গেলে এগুলি আবশ্যিক। তাই উপরোক্ত গ্রন্থে তিনি লিখছেন -

“নানান্ ওজরে ঠাসা বাহান্তরটা মতবাদের যুদ্ধে সবাইকে লিপ্ত হতে হচ্ছে, কারণ সত্যকে দেখবার ক্ষমতা কারুর নেই। রাস্তায় নিষ্কিণ্ড হচ্ছে কতগুলো মিথ্যা কাহিনীমাত্র। ...পারস্পরিক সৌহার্দ এবং ভালোমন্দের বিচার অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে... বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতাকে দূর করে অবস্থা স্বাভাবিক করতে হবে... ধর্ম ও বিশ্বাসের মূল সূত্রগুলির পর্যালোচনা করতে হবে।”^১

একটি বিষয় খুব সচেতন ভাবে মনে রাখতে হবে যে, রামমোহন শুধু উপলব্ধি করে বা প্রকাশ করেই থেমে থাকেননি; তিনি তাঁর এই ভাবনা তথা উপলব্ধিকে কার্যে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। রিফর্মেশন করতে গেলে পরিশোধিত চিন্তার দ্বারাই যে সেটা করা যাবে এটা তিনি পরিষ্কার বুঝেছিলেন। আর তার বীজটিকে আবিষ্কার করেছিলেন সনাতন হিন্দুধর্মের ধারক বেদান্তের মধ্যে। তিনি পাশ্চাত্যের মতো প্রাচীনতায় জড়বাদের অন্বেষণ করেননি; পরিবর্তে ভাববাদকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ ভারতীয় সমাজ ভাববাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ধর্মের নীতিগত দিকটিকে তিনি সংস্কারের বেড়া জাল থেকে মুক্ত করে প্র্যাকটিক্যাল করে তুলতে চেয়েছিলেন। যে বেদান্ত বা উপনিষদের ধারণাকে তিনি বাস্তবের সঙ্গে অস্থিত করতে চেয়েছিলেন তা আসলে কিন্তু স্বয়ং-বাস্তব – অ-সম্প্রজ্ঞাত জ্ঞানের কারণে তার প্রায়োগিক দিকটি ছিল অবহেলিত। তারই ইমপ্লিমেন্টেশন করলেন রামমোহন। উপনিষদের মূলকথাকে তিনি যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন সেটাই বলেছেন ‘The Universal Religion’ রচনার মধ্যে -

“2. Q. To Whom is worship due?

A. To the AUTHOR and Governor of the Universe, which is incomprehensively formed, and filled with an endless variety of men and things; in which, as shown by the Zosiac... the Sun, the Moon, the planets and the stars perform their rapid courses; and which is brought with animate and inanimate matter of various kinds, locomotive and immovable...

3. Q. What is he?

A. ...neither the sacred writings nor logical argument cas define his nature.”^২

বস্তুতঃ এই বিশ্বজনীন, বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের ধারণা থেকেই রামমোহনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি।

রামমোহনের সংস্কার আন্দোলনের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল স্ত্রীগণের প্রতি সহমর্মিতা। এই প্রণোদনা থেকেই তিনি সতীদাহ প্রথা নিবারণ, নারীগণের বিষয়সম্পত্তিতে অধিকারের প্রদান তুলেছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রামমোহনের সংস্কারচিন্তা তাঁর স্বচ্ছ ধর্মীয় ভাবনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। ফলে শাস্ত্রীয় নানা বিধিবিধান সম্পর্কেও তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁর এই সংস্কারমূলক ভাবনার কতকগুলি নিজস্ব ধারা লক্ষ্য করা যায় যেমন -

১. বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা,



২. সেই বিষয় সম্পর্কে পূর্বজন্দের কোন বক্তব্য আছে কিনা তা অনুধাবন করা,
৩. প্রখর ও যুক্তিনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞান,
৪. বিরুদ্ধবাদীগণের মতকে খণ্ডন করার মতো তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি,
৫. আপন মতকেই সঠিক এবং প্রামাণ্য বলে জোর করে প্রতিষ্ঠা না করা,
৬. কোন সংস্কারকে চিন্তায় ও প্রয়োগে জোর করে চাপিয়ে না দেওয়া,
৭. নিজের চিন্তন ও মননকে কোনোভাবেই কোনকিছুর দ্বারা প্রভাবিত হতে না দেওয়া,
৮. সংস্কারের ভাবনাকে দেশ-কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে প্রসারিত করে দেওয়া।

এই উদারীকরণের জায়গা থেকেই তাঁর সঙ্গে সেকালের রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরোধ দেখা দিয়েছিল। রামমোহন আপন সংস্কার চিন্তায় শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেই সময়ে প্রাচীন সনাতন সংস্কৃত শিক্ষা এবং আধুনিক ইংরাজী শিক্ষা –এই দুইয়ের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল। ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিরোধ ঘোরতর ভাবে দেখা যায়। তৎকালীন ব্রিটিশ রাজশক্তি সেই সময়ে বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে যদিও শাসকের রাজদণ্ড ধারণ করে ফেলেছিল তবুও তারা পুরাতন শিক্ষা, রীতি, রেওয়াজের প্রতি খড়াহস্ত হয়নি। নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার প্রয়াসেই তারা প্রাচীন বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিত। নানা বিতর্কবিবাদের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে নূতনতর রীতি, শিক্ষা ইত্যাদির প্রচলন হতে শুরু করে। এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ও সুপণ্ডিত হয়েও সংস্কৃত কলেজ স্থাপন এবং সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন। তবে এই বিরোধিতাকে ভাবার্থে সংস্কৃত বিরোধিতা হিসাবে ধরলে চলবে না; যদি তাই হত তাহলে রামমোহন স্বয়ং উপনিষদাদির অনুবাদ করে প্রচারের ব্যবস্থা করতেন না। তিনি বাস্তব এবং প্রায়োগিক দিক থেকে এই বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে দেশবাসীর উন্নতি সম্ভব নয়। উনিশ শতকে সংস্কৃত শিক্ষা ভারতীয়দের বৃত্তিগত ভাবে তথা জীবিকা নির্বাহের জন্য ফলপ্রসূ হবে না। যে বণিক ইংরেজ ভারতবর্ষকে শাসন করার দায়িত্ব নিয়েছে তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে ইংরাজী শেখাটা একান্ত দরকার। তবে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে নূতনকে বরণের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় সনাতনী ধারা মানুষকে মানসিক স্থিতাবস্থা দেবে আর পাশ্চাত্য শিক্ষা দেবে ব্যবহারিক স্থিতি – এই দুইয়ে মিলে মানুষের উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। এই বিষয়ে মহাত্মা শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন –

“রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমর্হাষ্টকে যে পত্র লেখেন তাহাকেই এই নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে। তিনি যেন স্বদেশবাসীদের মুখ পূর্ব হইতে পশ্চিমে ফিরাইয়া দিলেন। তবে ইহা স্মরণীয় যে, তাঁহাতে যাহা ছিল অপর কোন নেতাতে তাহা হয় নাই। তিনি নবীনের অভ্যর্থনা করিতে গিয়া প্রাচীন হইতে পা তুলিয়া লন নাই। হিন্দুজাতির কোথায় মহত্ব তিনি তাহা পরিকাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং তাহা সম্বন্ধে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্যনীতি ও পাশ্চাত্য জনহিতৈষণাকে অনুকরণীয় মনে করিয়াছিলেন।”^৩

বিষয় সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার নিয়ে রামমোহন সরব হয়েছিলেন। সতীদাহের সঙ্গে সম্পত্তির একটি যোগ ছিল। অনেক কুলীনেরই একাধিক স্ত্রী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁরা সহমৃত্যু হলে স্বামীর বিষয়সম্পত্তির ভাগিদার কমে যেত। সতীদাহের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে রামমোহন দেখেছিলেন যে, এই সতীদাহ আসলে পরিকল্পিতভাবে স্ত্রী হত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রনির্যাসে দেখিয়েছেন যে, সহমরণ নারীর ইচ্ছাধীন, জোর করে সহমৃত্যু করার চেষ্টা সামাজিক ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বামীর মৃত্যু পরে স্ত্রী সহমৃত্যু না হয়ে ব্রহ্মচারিণী হয়ে দিনাতিপাত করতে পারেন।

“ভর্তার মৃত্যু হইলে পর, স্ত্রী ব্রহ্মচার্য্য করিবেন, কিম্বা জ্বলচিতারোহণ করিবেন, এমন অর্থ করিলে ইচ্ছা বিকল্প হয়, তাহাতে অষ্ট দোষ শাস্ত্রে কহিয়াছেন, অতএব ব্যবস্থিত বিকল্প গ্রাহ্য করিতে হইবেক; তাহাতে



অর্থ এই, যে জ্বলচ্চিত্তারোহণে অসমর্থা যে স্ত্রী সে ব্রহ্মচর্য্য করিবেক, এই অর্থেরই গ্রাহ্যতা, এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত স্কন্দপুরাণের বচন ও অঙ্গিকার বচন লিখিয়াছেন। উত্তর [দুই] সর্ব দেশে সকলের নিকট এই নিয়ম, যে শব্দানুসারে অর্থের গ্রাহ্যতা হয়, এ স্থলে বিষুণ্ডর বচনে পাঁচটি শব্দমাত্র দেখিতেছি। মূতে ১ ভর্ত্তরি ২ ব্রহ্মচর্য্যং ৩ অথবা সহগমন ৫। অতএব ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম গ্রহণ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য বিধবার শ্রেষ্ঠ ধর্ম হয়।”^৪

সতীপ্রথা উচ্ছেদ করতে তিনি চেয়েছিলেন ঠিকই তবে তা আইন করে নয়; বরং এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে। কারণ তিনি জানতেন যে, আইন করে কোন বিষয় চাপিয়ে দিলে ঘুরপথে সেই আইনের বাইরে গিয়ে মানুষ তার আজন্মলালিত সংস্কারকে কোন না কোন ভাবে ফলপ্রসূ করতে চাইবে। আর এটাও ঠিক যে, সেকালের এই সহায়সম্বলহীন বিধবারা নানাভাবে অত্যাচারিত হত। ফলে সতী হওয়া কেবল সংস্কার ছিল না; ছিল তাদের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায়। -

“It is not from religious prejudices and early impressions only, that Hindu widows burn themselves on the piles of their deceased husbands, but also from their witnessing the distress in which widows of the same rank in life are involved, and the insults and slights to which they are daily subjected, that they become in a great measure regardless of their existence after the death of their husbands; and this indifference, accompanied with the hope of future reward held out of them, leads them to the horrible act of suicide.”^৫

রামমোহন তৎকালীন ভারতে প্রচলিত দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা আইনের মধ্যকার তফাৎকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। জীমূতবাহনের দায়ভাগে কোন ব্যক্তি তাঁর জীবিতকালে কেবলমাত্র নিঃসন্তান পত্নীকেই আপন উত্তরাধিকারী রূপে স্বীকৃতি দিতে পারতেন। জীববৎসা পত্নীর পতির সম্পত্তিতে কোন অধিকার ছিল না। এমনকী পুত্রের মৃত্যু হলেও মাতা পুত্রের সম্পত্তি পেতেন না। ফলে একজন পুত্রসন্তানবতী মাতাকে সব সময় পতি অথবা পুত্রের উপর নির্ভর করতে হত। বিমাতার জন্যও কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে মাতা, বিমাতা - সকলকেই স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভর করতে হত। সেই পুত্রের মৃত্যু হলে সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো পুত্রবধূ। যাঁজবন্ধ্য, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি প্রমুখ আইনপ্রণেতাগণ পিতার সম্পত্তিতে কন্যার এক চতুর্থাংশ অধিকার রেখেছিলেন। কিন্তু দায়ভাগে এই অধিকার তুলে দেওয়া হয়। এই জন্য রামমোহনের যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। এমনকী ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থ সম্প্রদায় পণের বিনিময়ে যেভাবে বহুবিবাহ করতেন - সেটিকেও রামমোহন তুলে ধরেছেন। পিতৃ-সম্পত্তিতে অধিকার - বধিগত নারীরা তাদের ভাইদের কাছে পণ্য হয়ে উঠেছিল। বিবাহ নামক ব্যবস্থায় তাদের বেশী দামে বিক্রয় করা হত। -

“These so far from spending money on the marriage of their daughters or sisters receive frequently considerable sums, and generally bestow them in marriage on those who can pay most.”^৬

জীমূতবাহন এও বলেছিলেন যে, স্বামী যদি প্রথমা পত্নী বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ করেন তাহলে তাঁর সম্পত্তির কিছু অংশ (আধিবেদনিক) আগের স্ত্রীকে দান করবেন। তবে বহ্মালসেনের কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তনের পর এই আধিবেদনিক স্বত্ব সম্ভবত লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং বহুবিবাহ কুলীন সম্প্রদায়ের কাছে এক জাতীয় উপার্জনের অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। রামমোহন আইনের খেলা বুঝতেন। ফলে তার জটিলতার দিকটি তাঁর নজর এড়ায়নি। জীমূতবাহনের দায়ভাগের ব্যাখ্যা অনুসারে বাঙ্গালি হিন্দুর পৈতৃক ও স্নোপার্জিত সম্পত্তিতে সমান অধিকার ছিল। এই দুই ধরনের সম্পত্তিই তাঁরা ইচ্ছা মতো দান/বিক্রয় করতে পারতেন। এমনকী সেই সময়কার বাঙালিরা এই দুই জাতীয় সম্পত্তিবিশয়েই উইল করতে আরম্ভ করেছিলেন। ভারতের অন্যত্র দায়ভাগের প্রচলন না থাকায় সেখানে পুত্র জন্মগ্রহণ করেই সম্পত্তিতে পিতার সমান অধিকার



পায়, ফলে পিতার আর দান/ বিক্রয়/ উইলের কোন অধিকার থাকে না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ১৮১৬ সালে সুপ্রিম কোর্ট ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলাতেও এই আইন বলবৎ করে যে, পুত্র বিদ্যমানে সম্পত্তিতে পিতার অধিকার অবাধ নয়। ১৮৩০ সালে এই কলকাতাবাসী হিন্দুকুল এই মতের প্রতিবাদ করেন এবং তাদের সমর্থনে রামমোহন বিচারের প্রতিবাদে “Essay on the Rights of Hindoos over ancestral property according to the law of Bengal” নামে এক পুস্তিকা লেখেন। সেখানে তিনি মিতাক্ষরা ও দায়ভাগের নিদর্শন তুলে দেখিয়েছেন যে, ভারতের অন্যত্র এবং বাংলায় প্রচলিত আইন পৃথক। প্রাচীন স্মৃতিকারগণের প্রবর্তিত এই আইন যে ইংরেজ সরকার অগ্রাহ্য করতে পারে না সেটাই এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন –

“হিন্দু-আইনে স্বামী ও পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে এই ব্যাপার ঘটেছে তা পূর্বে উল্লিখিত ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের *Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindoo Law of Inheritance* নামক সন্দর্ভে রাজা প্রমাণ দিয়ে বিশদ করে দেখিয়েছেন। ঐ সম্পর্কে স্মৃতিকারদের বচন এবং নিবন্ধকারদের ব্যাখ্যা তুলে তিনি দেখিয়েছেন যে, স্মৃতিকারেরা যেখানে স্বামী ও পিতার ত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রী ও কন্যার ছেলে ও ভাইদের সঙ্গে প্রথম পক্ষে সমান ও দ্বিতীয় পক্ষে এক-চতুর্থ অংশ উত্তরাধিকার স্পষ্ট নির্দেশ করেছিলেন, নিবন্ধকারদের ব্যাখ্যায় তা সম্পূর্ণ না হয়ে কার্যত রদ হয়েছিল। রামমোহন মত প্রকাশ করেছিলেন যে, স্ত্রীলোকের এই উত্তরাধিকারহীনতা হিন্দুসমাজে তার নানা দুরবস্থা এবং কুলীনের বহুবিবাহ প্রভৃতি নানা কুপ্রথার জন্য অনেকটা দায়ী এবং তিনি আশা করেছিলেন - ‘The humane attention of the Government will be diverted to those evils which are the chief sources of vice and misery and even suicide among women’. অভিজ্ঞ লোকেরা জানেন রামমোহনের এ আশা সফল হয় নাই। বরং ইংরেজ আদালতের বিচারে যেখানে মিতাক্ষরা-আইনে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি উত্তরাধিকার ও স্বত্ব সম্বন্ধে কতকটা সুব্যবস্থা ছিল তাকেও উপেক্ষা করা হয়েছে।”^৭

কথা সমাপন : উপরোক্ত সাধারণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা চলে যে, রামমোহন ধর্ম, সমাজ, আইন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুগপৎ প্রবর্তক এবং নিবর্তকের ভূমিকা পালন করেছেন। এই প্রবর্তনা তাঁর ব্যক্তিক চেতনার মর্মমূল থেকে উৎসারিত প্রজ্জ্বলীঢ় উপলব্ধি-সঞ্জাত আর সেই পাদপীঠ থেকেই উৎসারিত নিবর্তনের অভিব্যক্তি। কোনটাই বাহ্যিক নয়। এক অনুভবী সত্তার যুগনন্দ রূপ রামমোহন : প্রবর্তক ও নিবর্তক।

Reference:

১. রায়, রামমোহন, ‘তুহফাতুল মুয়াহহিদ্দীন’, অনুবাদ- রাজেশ্বর মিত্র, কলিকাতা, জিঞ্জাসা, ১৯৮৫, পৃ. ১২, ২০
২. Roy, Rammohun, ‘Selected Works of Raja Rammohun Roy’, New Delhi, Publication Division, Government of India, 1977, p. 281-286
৩. শাস্ত্রী, শিবনাথ, ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’, কলিকাতা, এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, (প্রকাশসাল বিহীন), তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১০০
৪. রায়, রামমোহন, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, রামমোহন রচনাবলী, অজিত কুমার ঘোষ সম্পাদিত, কলিকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৩, পৃ. ১৯০
৫. রায়, রামমোহন, BRIEF REMARKS REGARDING MODERN ENCROCHMENTS ON THE ANCIENT RIGHTS OF FEMALES, রামমোহন রচনাবলী, অজিত কুমার ঘোষ সম্পাদিত, কলিকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৩, পৃ. ৪৯৬-৪৯৭
৬. তদেব, ঐ, পৃ. ৪৯৯



৭. গুপ্ত, অতুলচন্দ্র, রামমোহন ও ইঙ্গ-ভারতীয় আইন, রামমোহন চর্চা, সংকলন ও সম্পাদনা, গৌতম নিয়োগী, কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, পৃ. ১৩১-১৩২

Bibliography:

নিয়োগী, গৌতম, সংকলন ও সম্পাদনা, রামমোহন চর্চা, কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রথম প্রকাশ ২০১৮
নূরুল, ইসলাম মনজুর, রামমোহন রায় ও তৎকালীন বাংলার সমাজ, ঢাকা, বাংলাদেশ, সমতট প্রকাশনী, প্রথম
প্রকাশ ১৯৯০
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, কলিকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সি, প্রথম সংস্করণ
১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ ২০০৭
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ - রামমোহন রায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষৎ, প্রথম শোভন সং ২০১৬
ভৌমিক, তাপস, সম্পাদিত, সার্ধ-দ্বিশতবর্ষে রামমোহন, কলিকাতা, কোরক, প্রথম প্রকাশ ২০২২
রায়, রামমোহন, রামমোহন রচনাবলী, অজিত কুমার ঘোষ সম্পাদিত, কলিকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ
১৯৭৩
শাস্ত্রী, শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, তৃতীয় সংস্করণ,
(প্রকাশসাল বিহীন)